*The* Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXX, pp 207-231, ISSN 2306-3920

# বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্য : সমাজভাবনা

**মোছা. আমিনা খাতুন***

[**সার-সংক্ষেপ :** বাঙালি মুসলিম সমাজে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেছিলেন। আবুল ফজল বলেন, মুসলমান লেখকরা নিজেদের সমাজের সত্যকার রূপ জানেন না। রণেশ দাশগুপ্তের মতে, সমাজ ও রাজনীতি আলাদা নয়। রাজনীতি চলমান সংগ্রাম ও সমাজের চালিকাশক্তি। আবদুল হক বলেন, মুসলমানরা নিজেকে দীর্ঘদিন বাঙালি বলে ঘোষণা করেনি। এখানে সে বিচ্ছিন্ন ছিল। আহমদ শরীফ মনে করেন, ভারতীয় সমাজে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব ছিল– যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বদরুদ্দিন উমর সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চান। আবুল কাশেম ফজলুল হক বর্তমান সমাজের পরিবর্তন কামনা করেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মনে করেন, অরাজকতা, দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমান বাংলাদেশের সমাজকে আক্রান্ত করে আছে। আহমদ ছফার মতে, বাঙালি মুসলমান সমাজের অধিকাংশ বাংলার আদিম কৃষিভিত্তিক কৌম সমাজের লোক। তাদের চিন্তায় আদিম চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। সমাজ সম্পর্কে প্রাবন্ধিকগণের এসব ভাবনাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।]

আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম প্রধান রূপ প্রবন্ধসাহিত্য। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে প্রবন্ধসাহিত্য অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে গদ্যের প্রচলনের কারণে প্রবন্ধের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ধারাবাহিকভাবে বাংলা গদ্য রচনার সূত্রপাত হয়। (গোপাল হালদার ২০১৫ : ৮২)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮১৯) *প্রবোধচন্দ্রিকা* (১৮৩৩) জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগ্রন্থের নিদর্শন। তাঁর অপর গ্রন্থ *বেদান্ত চন্দ্রিকা*ও (১৮১৭) প্রবন্ধগ্রন্থ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। 'মৃত্যুঞ্জয় প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে মুখ্যত রামমোহনের অনুসারী ছিলেন।' (অধীর দে ১৯৯৬ : ৩৫)। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৫-২০০৩) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ গদ্যশিল্পী বলেছেন। তিনি বলেন : 'বিদ্যাসাগরের পূর্বে যথার্থ ভাষা শিল্পী ছিলেন এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়।'

---

* **ড. আমিনা খাতুন :** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

(অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬ : ২৫৫)। যুক্তিনিষ্ঠ ও বিচারপ্রধান রচনা তথা প্রবন্ধসাহিত্যের সূচনা হয় রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) হাতে। তিনিই সর্বপ্রথম গদ্য রচনাকে ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক সমস্যার বাহন করে তোলেন এবং গদ্যের মধ্যে যুক্তিকে আনয়ন করেন। রামমোহনের প্রতিভামণ্ডিত রচনাকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিচারতর্কাশ্রয়ী প্রবন্ধের মর্যাদায় অভিহিত করা চলে।

বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসে অভিজ্ঞ অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) অলৌকিকতা, ঈশ্বরভক্তি ও অধ্যাত্মচেতনাকে পরিত্যাগ করে বাহ্যবস্তু ও মানবপ্রকৃতির সম্পর্ক আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন। (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৩ : ৪০)। অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিক চেতনা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮১৯-১৮৯১) মানব-হিতৈষণা উনিশ শতকের রেনেসাঁকে সম্ভাবিত করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভাষান্তরের মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টি করলেও তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলো মৌলিক চিন্তার পরিচয়বাহী। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কালের অপর উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ও অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা ধর্মীয় খাতে প্রবাহিত হলেও অক্ষয়কুমার দত্ত যুক্তিকেই তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিয়েছিলেন। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে ভূদেব চৌধুরী বলেছেন : "বাংলা গদ্যের শরীরে বক্তব্যের প্রাঞ্জলতাকে অতিক্রম করে বক্তার মানসভঙ্গির ব্যঞ্জনা প্রথম সার্থক অভিব্যক্তি পেল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র যুগে।" (২০১৫ : ১১৪)। পরবর্তী পর্যায়ের প্রবন্ধকারদের মধ্যে সুচিন্তিত ও প্রগাঢ় চিন্তার প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫-১৮৯৪) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি শিক্ষার গভীরতার সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। "স্থিতধী ভূদেব ভারত সংস্কারকে 'ইয়ং-বেঙ্গল'দের মতো এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন না, হিন্দু কলেজের ছাত্র ও মাইকেলের সহপাঠী হয়েও তিনি ভারতের সনাতন ঐতিহ্যে বিশ্বাস হারাননি, কিন্তু আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৩ : ৪০)।

বাংলা প্রবন্ধ তার জন্মলগ্ন থেকেই সমাজ-অন্বেষার প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ ও সংস্কার এবং সমাজ-মানসের পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তাতে আত্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সমাজ-সংলগ্ন চিন্তার সমন্বয় ঘটেছিল। এঁরা কেবল বাংলা গদ্যেরই মুক্তি সাধন করেননি, সংস্কারের জগদ্দল পাথর ভেঙ্গে জাতির মন ও মননে প্রবাহিত করেছিলেন মুক্ত চেতনার অবাধ গতিবেগ, নবজীবনের উদ্দীপনা। (নবারুণ বিশ্বাস ২০১২ : ৬৩-৬৪)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) প্রমুখের হাতে প্রবন্ধের উপকরণ ও রূপ বিচিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে পূর্ণতা লাভ করেছে। এঁদের হাতেই বাংলা প্রবন্ধ সৃজনশীল স্বভাবধর্মে উন্নীত হয়। (রফিকউল্লাহ খান ২০০০ : ১৩০)। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রকৃত

অর্থে প্রবন্ধসাহিত্যের সূচনা হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে; তাঁরই পত্রিকা *বঙ্গর্দশন* (১৮৭২)-এর পাতায়। যদিও বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামমোহন রায়। (নবারুণ বিশ্বাস ২০১২ : ৬৪) । জাতীয় সংস্কৃতি ও সমজ জীবন অবলম্বনে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখলেও প্রবন্ধের উৎকর্ষ সাধনের দিকে তাঁর মন ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য :

> বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। রচনার অনতিপরিসর বন্ধনের মধ্যে কোনো বিষয়ে লেখকের বক্তব্যের পূর্বে ও তাঁর সমকালে বাংলায় প্রবন্ধের রূপ ছিল মোটের উপর এই অলংকৃত আদি রূপ– রামমোহন রায়ের ধর্মালোচনায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ সংস্কারের তর্কবিতর্কে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধগুলিতে। (১৯৯৩ : ৯)

প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা সাহিত্যে গদ্যের নতুন প্রতিমা নির্মাণ করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) ও সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) বলেন : ‘বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুসারী গদ্য এবং প্যারীচাঁদের আলালী ও কালীপ্রসন্নের হুতোমী বাংলাকে ভেঙ্গেচুরে বঙ্কিম বাংলা গদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।’ (২০১০ : ৭৮)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যের সমস্ত শাখার সমৃদ্ধির সঙ্গে প্রবন্ধসাহিত্যেও অভিনব যুগান্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রবন্ধসাহিত্যের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য আন্তর্জাতিক মানের হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের হাতেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সাহিত্যতত্ত্ব, সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম, আত্মস্মৃতি, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, শিক্ষা, রাজনীতি, ভ্রমণকাহিনি প্রভৃতি বিষয় তাঁর রচিত প্রবন্ধসাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। অধীর কুমার দে’র ভাষায় : ‘রবীন্দ্রপর্বে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন দ্রুততর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি, বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মশক্তির অধিকতর সমুন্নতি লক্ষ্য করা যায়।’ (২০০৭ : ১২)। সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যবিচার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তাঁর মননশীল চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে *প্রাচীন সাহিত্য* (১৯০৭), *লোকসাহিত্য* (১৯০৭), *আধুনিক সাহিত্য* (১৯০৭), *সাহিত্য* (১৯০৭), *সাহিত্যের পথে* (১৯৩৬), *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৯৪৩) প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থে। দেশের রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে *কালান্তর* (১৯৩৭), *সভ্যতার সংকট* (১৯৪১) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিস্ময়কর প্রতিভা দ্বারা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন।

*সবুজপত্র* (১৯১৪) নামক সাহিত্যপত্র সম্পাদনার মাধ্যমে যিনি সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন– তিনি প্রমথ চৌধুরী। তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায় *তেল নুন লাকড়ী* (১৯০৬), *বীরবলের হালখাতা* (১৯১৬), *রায়তের কথা* (১৯১৯),

*নানাচর্চা* (১৯৩২) প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থে। বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও শানিত যুক্তি তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্র পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২) বলেন : '১৯০৯ সালের গোড়াতেই প্রমথ বাবু চলিত-ভাষার সমর্থক রূপে দেখা দিলেন।' (২০১৫ : ২৪৯)। প্রবন্ধ ও গল্প– এ দুই ক্ষেত্রে তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল। তিনি ১৯১৪ সালে *সবুজপত্র* প্রকাশ করেন। এটি বাংলা ভাষায় প্রথম লিটল ম্যাগাজিন। (বুদ্ধদেব বসু ১৯৮৪ : ১৫২)। *সবুজপত্রের* মাধ্যমে তিনি প্রথম চলিত ভাষা ব্যবহারের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলা ভাষায় আধুনিক গদ্যের জনক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককে মুসলিম প্রাবন্ধিকদের চিন্তা-চেতনার উন্মেষকাল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সময়পর্বের এই তিরিশ বছর মুসলিম লেখকদের প্রস্তুতিকাল হিসাবে ধরা হয়। ১৮৭০ সালে মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে মুসলিম লেখকদের পথচলা শুরু হয়। তিনিই সমাজ-প্রগতির মূল স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন বাঙালি মুসলমানের ভাষাগত সংস্কার, দোভাষী পুথির রুচি, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে বেরিয়ে আসা প্রথম সার্থক শিল্পী। (আবুল আহসান চৌধুরী ১৯৯৩ : ৪৭)।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ড সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ফলে মধ্যবিত্তের যন্ত্রণা ও কালের সংকট এবং সাহিত্য–সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে ব্যক্তির ভাবনা যখন গদ্যশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তখনই কেবল আত্মপ্রকাশ করে প্রবন্ধ। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯৯ : ১২১)। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে উচ্চশিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে বাঙালির মননচর্চার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ জীবনে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ফলে আত্মসন্ধান ও সত্তাসন্ধানের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ঢাকা-কেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও অবিভক্ত ভারতে পূর্ববাংলায় ঢাকাকে কেন্দ্র করে মুসলিম প্রগতিশীল সাহিত্যিকবৃন্দের সম্যক চেষ্টায় ১৯২৬ সালে একটি সাহিত্য সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সাহিত্য সংগঠনের নাম– 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'।

বিভাগোত্তরকালে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে বাংলা প্রবন্ধ ও গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিমুখী ধারা তৈরি হয়। একটি পাকিস্তান ও তমুদ্দুনপন্থি ধারা এবং অপরটি প্রগতিশীল ও বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তার ধারা। তাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ধারণা, মানবতাবাদী, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারণা কার্যকর থেকেছে বলা যায়। তার সাথে সমাজতান্ত্রিক চেতনার রাজনীতি ভাবনাও এ দ্বি-ধারার সাথে যুক্ত হয়েছে, তবে তা গভীরভাবে সমাজ ও রাজনীতিমনস্ক ধারা হলেও একটি ক্ষীণ ধারা হিসাবেই তা বহমান থেকেছে। (মোঃ হাবিবুর রহমান ২০০৩ : ২১-২২)।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে ভৌগোলিক কারণে দুই অঞ্চলের সংস্কৃতির মধ্যেও পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে যাঁরা প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন তাদের কাছে প্রবন্ধে ভাষাশৈলী কিংবা নান্দনিকতার মূল্য ছিল গৌণ।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০০ : ১৩৩)। এসময় প্রাবন্ধিকেরা জাতীয় জীবনের নানা দ্বন্দ্বময় ও জটিল অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এসময়ে মার্কসীয় চিন্তা-চেতনাকে আত্মস্থ করে যাঁরা প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭) অন্যতম। মার্কসীয় চিন্তা-চেতনাকে সমন্বিত করে তাঁরা প্রবন্ধ রচনা করেন। রণেশ দাশগুপ্তের *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (১৯৫৯), *শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে* (১৯৬৬), *আলো দিয়ে আলো জ্বালা* (১৯৭০) প্রভৃতি গ্রন্থে মার্কসীয় তত্ত্বচিন্তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। আবদুল হকের প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাষা-আন্দোলন, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি। এসব ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর *ক্রান্তিকাল* (১৯৬২), *বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৭৩), *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ* (১৯৬৮) প্রভৃতি গ্রন্থে। সামাজিক দায়বদ্ধতা, মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিশীলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য আবুল ফজলের প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। *সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র* (১৯৬৮), *সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন* (১৯৬৪), *সমকালীন চিন্তা* (১৯৭১), *মানবতন্ত্র* (১৯৭৩) *শুভবুদ্ধি* (১৯৭৪) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ।

বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যে ভাষা-আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে ভাষা-আন্দোলন যেমন গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা যুগান্তকারী সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারির রেনেসাঁসীয় গতিবেগ সাহিত্যের সকল শাখাকে প্লাবিত করে। বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে ভাষা-আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে ভাষা-আন্দোলন যেমন বিশাল একটি স্থান দখল করে আছে, তেমনি প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভাষা-আন্দোলনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ এক যুগান্তকারী সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্ভুবনে ভাষা-আন্দোলনের মত প্রভাবসঞ্চারী কোনো অনুষঙ্গ নেই। ২১শে ফেব্রুয়ারির রক্তিম উজ্জীবন যে রেনেসাঁসীয় গতিবেগ সৃষ্টি করেছিল তা বাঙালির মনীষায় এক বিপ্লবাত্মক রূপান্তরকে অনিবার্য করে তোলে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। বাংলাদেশে খুব কম লেখক আছেন— যাঁরা ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে গল্প, উপন্যাস, নাটক, ছড়া বা প্রবন্ধ লেখেননি। ভাষা-আন্দোলনের মৌল চেতনা লেখকদের সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০০০ : ১২৬)।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যের মূল্যায়ন করে বলেছেন যে, আমাদের দেশের গত পঁচিশ বছরের প্রাবন্ধিক চিন্তার

বৃহত্তর অংশকে সমাজ-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম এ তিনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে এই কালে। যাঁরা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছেন তারাই উৎকৃষ্ট ও অগ্রসর চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। এঁদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭), বদরুদ্দীন উমর (জ. ১৯৩১), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (জ. ১৯৩৬), আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১), হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪) ও আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সমান্তরালে ও অনুসরণে অনেক লেখক আত্ম-প্রকাশ করেছেন। অনুসন্ধানে অগ্রসর হলে এঁদের বাইরেও অনেকের লেখার মধ্যে সৃষ্টিশীল চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে। (আবুল কাসেম ফজলুল হক ১৯৯৬ : ১৪২-১৪৩)। এসময়ের প্রাবন্ধিকদের নিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৪৩-২০১০) বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭) মার্কসীয় ধারার প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধ শেষ পর্যন্ত তাত্ত্বিকতাকে অতিক্রম করে যায়, এখানেই তাঁর শিল্পিত বিজয়। আবদুল হক ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন। পঞ্চাশের দশকে হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩) একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন। আহমদ ছফা তেজস্বী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর বক্তব্য। আবুল কাসেম ফজলুল হক (জ. ১৯৪৪) সাহিত্যের বিচার করেছেন আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৮৮ : ১৩-১৪)।

বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতি বা অবস্থা কী– তা নিয়ে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'সহ আবুল ফজল, রণেশ দাশগুপ্ত, আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল হক, বদরুদ্দীন উমর, আহমদ ছফা, আবুল কাশেম ফজলুল হক– এ আটজন লেখকের চিন্তা তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সেসঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশে সমাজ নিয়ে যেসব ভাবনা-চিন্তা চলছে– তাতে বাংলাদেশের সমাজের একটা প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে। আবুল ফজল কিংবা রণেশ দাশগুপ্ত যদিও অনেক আগের মানুষ, তবু তাঁদের জীবনকাল আমাদের কালে এসে ঠেকেছে এবং তাঁদের ভাবনা আমাদের কালকে স্পর্শ করেছে। অন্যদিকে আবদুল হকও অনেক আগের মানুষ, তবুও তাঁর জীবনকাল বিশ শতকের শেষের দিকে এসে ঠেকেছে। এজন্যে তাঁর রচনায় সমকালীনতা দেখা দিয়েছে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও এছাড়া আটজন মনীষীর প্রবন্ধসাহিত্যে সমাজ-বিষয়ক ভাবনা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের সমাজের বর্তমান অবস্থা ও গতিপ্রকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

১৯২৬ সালে ঢাকায় জন্ম হয়েছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র। কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৯৯৬-১৯৩৮) প্রমুখ মনীষী এ সাহিত্য সমাজে ছিলেন। উদ্দেশ্য– মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন ও বুদ্ধির মুক্তি ঘটানো। কিন্তু

মুসলিম সমাজে সে কাজের প্রয়োজন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। আহমদ ছফা, আবদুল হক ও আবুল ফজল– এঁদের সমাজ নিয়ে, নিজের সমাজ নিয়ে মাথাব্যথা ছিল, ভাবনা ছিল। এজন্যে এঁদের লেখায় মুসলিম সমাজ নিয়ে সরাসরি অনেক ভাবনা পাওয়া যায়। আবদুল হক অস্থির মুসলমান সমাজকে দিক-নির্দেশনা দেন– বিশেষ করে মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয় কী হবে– সে বিষয়ে। সমাজ আগে থেকে ছিল– কিন্তু তার চেতনাপ্রবাহ কোন দিকে নিতে হবে– সে বিষয়ে তিনি বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। রণেশ দাশগুপ্তের সমাজভাবনা রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁর সব কথাই রাজনীতি নিয়ে। এজন্যে পৃথকভাবে সমাজ বিষয়ে তাঁর কথা খুব অল্পই মেলে। তবুও সমাজকে তিনি দেখেছেন– ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে। আহমদ শরীফ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সমাজ ও রাজনীতিকে আলাদা করে দেখেন না। সম্ভবত এঁরা মুসলিম সমাজকে বাঙালি সমাজ বলেই জানেন। শুধু নামাজ-রোজা-ইদ, ধর্মীয় শব্দ ও কিছু আচার বাদে মুসলিম সমাজকে আলাদা করে দেখেন না। অর্থাৎ আগে থেকে এখানে মুসলিম সমাজ যে ভিত্তি পেয়েছে, সেটাই তার মূল। এজন্যে বাঙালি মুসলমান সমাজে আলাদা কিছু দেখা যায় না। হিন্দুসমাজে যেমন তার আচার-বিচার-প্রথা ও সমাজের আরও বহু বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা পাওয়া যায়– মুসলিম সমাজ নিয়ে আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবুল কাসেম ফজলুল হক– এঁদের সেরকম কোনো বিশেষ ভাবনা নেই। আবুল ফজল মুসলিম সমাজের অন্দর-মহলের খোঁজ রাখেন এবং উপন্যাসে তার রূপ দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা* উপন্যাসে গোরা যখন বাঙালি হিন্দু নারীর মর্যাদাকে বিনয়ের কাছে উপস্থাপন করেন– তখন সে সমাজের একটা চিত্র পাওয়া যায়। আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বা বদরুদ্দীন উমর– এঁরা কেউ সে বিষয়ে বিশ্লেষণে যাননি। সম্ভবত আবুল ফজলের কথাই ঠিক যে, মুসলমান লেখকরা মুসলমান সমাজের কথা জানেন না– বিশেষত এর ভিতরের আচার-ব্যবহার-প্রথা-নীতি-নৈতিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে। এঁরা সকলে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত থেকে এসেছেন– বৃহত্তর মুসলিম সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ তাঁদের হয়নি– একথা সত্য। আহমদ ছফা– মুসলিম সমাজের ভেতরের সূক্ষ্ম কাঠামোর কথা বলেননি– অথচ সমাজের ভাবনা কেন হিন্দু সমাজের চেতনা থেকে পৃথক হল না– এটাই তাঁর সমাজচিন্তার উপজীব্য। বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের বাস্তবতা আলাদা, আহমদ ছফা এটা মনে করেন– কিন্তু তার বিশেষত্ব কোথায় বা কেউ নির্মাণ করেছেন কি-না– সে বিষয়ে তিনি তেমন কিছু বলেননি।

বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যে সমাজ বলতে মুসলমান সমাজ অর্থাৎ বাঙালি মুসলিম সমাজের কথাই বলা হয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের পূর্বে মুসলমান সমাজ সেভাবে নিজেদেরক গড়ে তোলার বিষয়ে সচেতন ছিল না কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর

বাঙালি চেতনা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং বাঙালি মুসলমান সমাজ নিজের বিশিষ্টতা অর্জনে সচেষ্ট হয়। ফলে শুরু হয় নিজের সমাজের গড়ন ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা। নিম্নে সে বিষয়ে পূর্বোক্ত লেখকদের ভাবনায় সমাজভাবনা সম্পর্কিত আলোচনা করা হল।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বাঙালির, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের, মুক্তবুদ্ধিচর্চার একটি স্মরণীয় প্রতিষ্ঠান।' (আবুল আহসান চৌধুরী ২০১৫ : ১১)। জগৎ ও জীবনকে যুক্তির নিরিখে বিচার করার মূলমন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। মুসলিম সাহিত্য সমাজের :

> দৃষ্টি ছিল যুক্তিবাদীর দৃষ্টি, চিন্তা সংস্কারের দৃষ্টি, এবং সমাজ সংস্কারের। তাঁদের দৃষ্টি ছিল রেনেসাঁর দৃষ্টি : চিন্তার গতানুগতিকতা থেকে এবং ঐতিহ্যের অন্ধ-অনুবর্তিতা থেকে তাঁরা বাঙ্গালী মুসলিম-সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, অতীতের, ইসলামের এবং বর্তমানে যা কিছু ভালো তা আত্মসাৎ করে তাকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন সঙ্কীর্ণতামুক্ত সুস্থ উদার বিশ্বমানবতার আকাশতলে, যেখানে বাঙ্গালী মুসলমান বিশ্বজনীন চিন্তার অংশীদার, এবং আধুনিক জগতের প্রাগ্রসর সমাজ ও জাতিসমূহের সমপর্যায়ে সৃষ্টিচঞ্চল। (আবদুল হক ১৯৭৮ : ৪৪০)

তবে মুসলিম সাহিত্য-সমাজ স্বাধীন-চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেছিলেন বাঙালি মুসলমান সমাজকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যেই। (খোন্দকার সিরাজুল হক ১৯৮৪ : ৫)। বুদ্ধির মুক্তি অর্থাৎ বিচার বুদ্ধিকে অন্ধসংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তিদান, মুসলমান সমাজের বদ্ধ কুসংস্কার ও বহুকাল সঞ্চিত আবর্জনা দূর করার চেষ্টাই ছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র সদস্যদের ব্রত ও উদ্দেশ্য। ১৯২৬ সালের একেবারে গোড়ার দিকে মুসলিম সাহিত্য সমাজের জন্ম। মুসলিম সাহিত্য সমাজের বীজমন্ত্র ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' (আবুল আহসান চৌধুরী ২০১৫ : ১১)। সাহিত্য সমাজের লেখকেরা বলেছিলেন বুদ্ধির মুক্তির কথা। তাঁরা আধুনিক জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এবং যুক্তির আলোকে তৎকালীন মুসলমানদের সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা ও মূল্যবোধগুলোকে নতুন করে দেখতে চেয়েছিলেন। বহু শতাব্দী পূর্বে মধ্যপ্রাচ্য বা মধ্য এশিয়ার চিন্তানায়কগণ যেসব চিন্তা করে গেছেন তাতেই মুসলমানদের যাবতীয় চিন্তার ইতি হয়ে যায়নি এবং নতুন চিন্তার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়নি। যুগে যুগে নতুন চিন্তার প্রয়োজন ছিল এবং আজো আছে। (আবদুল হক ১৯৭৮ : ৪৪০)। সাহিত্য সমাজের লেখকদের ভাষাটা ঠিক এরকম না হলেও তঁদের চিন্তাধারা ও বক্তব্য ছিল এরকম। আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, মুসলিম সাহিত্য সমাজের চেতনায় বাংলার রেনেসাঁর সঙ্কল্প ছিল। হিন্দু বাঙালির জাগরণের সঙ্গে মুসলিম সমাজকে তাঁরা সামিল করতে চেয়েছিলেন। 'হিন্দু-মুসলমান

মিলিত সাধনা দ্বারা তাঁরা জাতি গঠনে প্রয়াসপর হয়েছিলেন। কিন্তু বিজাতি সফল হলো, তাঁদের প্রয়াস সফল হলো না।' (আবুল কাসেম ফজলুল হক ২০১১ : ৩২৭)।

"'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র লেখকগণ ছিলেন মুক্তবুদ্ধির অনুসারী ও রেনেসাঁর সাধক। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সমর্থক তাঁরা ছিলেন না।" (খোন্দকার সিরাজুল হক ১৯৮৪ : ২৪৫)। এই সংগঠনের মুখপত্রস্বরূপ একটি পত্রিকা *শিখা* (১৯২৭) প্রকাশিত হয়। *শিখা* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পূর্ববাংলায় কয়েকজন সাহিত্যিক মুসলিম সমাজের সংস্কার আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। রেনেসাঁসের সমধর্মী এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৮), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) প্রমুখ। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ছিল এই সাহিত্য সংগঠনের ব্যাপ্তি। "মুসলিম সমাজের কোনো বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে নয়, এই সমাজ সম্বন্ধে সর্বব্যাপী ছিল 'সাহিত্য-সমাজে'র বক্তব্য। এর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, এর মনন ও আচরণ, এর কুসংস্কার, পরিবার জীবন, সামাজিক প্রথা, গোঁড়ামী, অতীতমুখীনতা, পশ্চিমমুখীনতা, ললিতকলাবিমুখতা, শিক্ষা সমস্যা কোনো কিছুকেই 'সাহিত্য সমাজ' এড়িয়ে যেতে চাননি, সব কিছু সম্বন্ধে সমকালীন চিন্তাধারার গলদ তাঁরা উন্মোচন করেছেন।" (আবদুল হক ১৯৭৮ : ৪৪০-৪৪১)। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের চিন্তকেরা মানবজীবনে ও প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাসের প্রয়োজন উপলব্ধি করতেন। কিন্তু কোনো বিশ্বাসকেই তাঁরা সনাতন, শাশ্বত, চিরন্তন বা অনন্ত-কালের জন্য সত্য বলে মানতেন না। তাঁরা মনে করতেন, বিকাশশীল সংস্কৃতির অন্তর্গত সবকিছুই বিকাশশীল। সভ্যতার বিকাশে ধর্মের ভূমিকাকে তাঁরা সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বুঝতে চাইতেন। সমকালীন মুসলমান বাঙালিদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে তাঁরা সামাজিক উন্নতি বা প্রগতির মূল অন্তরায় হিসাবে পেয়েছিলেন। সেজন্য এই বিশ্বাসকে তাঁরা ভাঙতে চেয়েছেন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, বিবেকসম্মত, যুক্তিগত, বিজ্ঞানভিত্তিক, উন্নততর, নতুন কল্যাণকর বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে। (আবুল কাসেম ফজলুল হক ২০০৮ : ২৮)।

বিশ শতকের প্রথম আড়াই দশকে মুসলিম প্রাবন্ধিকদের চিন্তাচর্চার ক্ষেত্র ছিল আরব, ইরাক, ইরান, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধান এবং ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা। বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের চিন্তকদের মাধ্যমে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে সম্ভাবিত হল ধর্মসংস্কারমুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের প্রয়াস।

সাহিত্যের জগৎ এবং সমাজ-মানস থেকে সংকীর্ণতা ও পশ্চাৎপদতা, ধর্মীয় উন্মাদনা ও অন্ধ গোঁড়ামির অনভিপ্রেত অপচ্ছায়া দূর করার জন্যে যাঁরা বিগত শতাব্দীর

সিংহভাগ জুড়ে আমাদের দেশে মানব-মুক্তির ও মানস-মুক্তির হাওয়া ছড়িয়ে দিয়েছেন সাহিত্য-শিল্পী আবুল ফজল ছিলেন তাঁদের অন্যতম পুরোধা। (মাহবুবুল হক ২০০৯ : ১০৪)। তিনি তাঁর "সমাজতন্ত্রের পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার লক্ষ্য কী হবে– এ সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত দেন। তিনি পুঁজিবাদের শ্রেণিদ্বন্দ্ব, শ্রেণিবৈষম্য, বিদ্বেষ প্রত্যাখ্যান করে মানবিক মূল্যবোধযুক্ত এবং শ্রেণিশোষণমুক্ত সমাজগঠনের আহ্বান করেছিলেন। মুহম্মদ এনামুল হকের (১৯০২-১৯৮২) মতে :

> আবুল ফজলের সাহিত্য সৃষ্টি প্রেরণার মূলে আছে ধর্ম। ধর্মের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ধর্মের মিল হয়েছিল, কোনো বিরোধ বাঁধেনি। ইসলামের মূলনীতি ও সমাজব্যবস্থায় তার প্রয়োগ, ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বিশেষ করে ইসলামের প্রতি আমাদের আচ্ছন্ন দৃষ্টি ও অহেতুক অন্ধপ্রীতি ফজল সাহেবের স্পর্শকাতর মনে একদিন যৌবনের উচ্ছ্বাসে যে-স্পন্দন জাগায়, তাই চৌচিরের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে তাঁকে করেছিল সাহিত্যিক। (২০০৯ : ২৩)

আবুল ফজল তাঁর "নারী জাগরণ" প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর অবস্থান ও শিক্ষার অবস্থার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুসলমান সমাজে নারী দীর্ঘদিন ধরে অবরুদ্ধ। মুসলিম সমাজে প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এর কারণ কেবল দারিদ্র ও অজ্ঞতা নয়। আবুল ফজল মনে করেন, নারীর অবরোধ প্রথাও তার জন্যে সমান দায়ী। কিছু পরিবার বাদে বৃহত্তর মুসলিম সমাজে নারী অবরোধ প্রথার শিকার আর অবরোধ প্রথা স্বাস্থ্যের জন্যও প্রতিকূল। কিন্তু আবুল ফজল মুসলিম সমাজে 'মেয়েদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী।' (আবুল ফজল ১৩৮২ : ৬৩৯)। প্রশ্ন– কেন তিনি নারী স্বাধীনতা চান। এর উত্তরে তিনি বলেন : 'কারণ স্বাধীনতা এমনি সম্পদ– যাহা মানুষকে ছোট হইতে বড় করে।' (১৩৮২ : ৬৩৯)। প্রাবন্ধিক বলেন যে, মুসলিম সমাজ নারী স্বাধীনতা চায় না। কারণ 'এখনো সে বিষয়ে তাহাদের সঠিক মতামত জানা যায় নাই।' (১৩৮২ : ৬৩৯)। লেখক বলেন, অবরোধ দূরীকরণে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বিশেষ কোনো আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে বলে লেখক জানেন না। তাই নারীর মুক্তির জন্য পুরুষদের আন্দোলন অনেকটা ব্যর্থতার প্রকাশ বলে লেখক মনে করেন। অন্যদিকে পুরুষদের এ ধরনের আন্দোলন 'নারীর ব্যক্তিত্বের প্রতি চরম অপমান।' (১৩৮২ : ৬৩৯-৬৪০)। প্রাবন্ধিক বলেন, অবরোধ দূরীকরণের যদি কোনো দরকার থাকে তাহলে 'সে আন্দোলন নারীদের পক্ষ হইতে আসা উচিত।' (১৩৮২ : ৬৪০)। লেখক বলেন, সমাজে নারী আজও পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত। 'পুরুষের এই ভোগ-লালসাই নারীর অবরোধের মূল কারণ।' (১৩৮২ : ৬৪১)। নারী এ অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করেনি। পুরুষের ভোগের সংস্কার ও

নারীর নিজের অবরোধে থাকার সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া চাই। তবেই অবরোধ প্রথা ভাঙার প্রয়াস দেখা যাবে। আবুল ফজল "প্রথা" প্রবন্ধে বলেন, 'যে বিষয়টা চলিয়া আসিয়াছে অথবা চলিতেছে তাহাই প্রথা। বিংশ শতকে এসেও মুসলমান সমাজে যাঁহারা এ প্রথার মোহ এড়াইয়া একটু অগ্রসর হইতে চাহিতেছেন, তাহাদিগকে ভ্রষ্ট, কুপথগামী, নাস্তিক, ধর্মবিরোধী, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি হরেক রকমের উপাধি দিয়া তাহাদের গতিপথ রুদ্ধ করিবার অহেতুক চেষ্টা চলিতেছে।' (১৩৮২ : ৬৯৪)। এতে সমাজের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রাবন্ধিক আশা করেন যে, মুসলিম সমাজের নবীনেরা যেন পুকুরের মতো অবরুদ্ধ না থেকে নদীর মতো মুক্ত হয়ে ছুটে চলে। "মুসলমান কথা-সাহিত্যের গতি ও পরিণতি" প্রবন্ধে আবুল ফজল বলেন, মুসলমান লেখকেরা নিজের সমাজের সত্যকার রূপ জানেন না। তাই 'শক্তিশালী লেখকদের হাতে পড়েও সাহিত্য অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়।' (১৩৮২ : ৫৭১)। প্রাবন্ধিক অভিযোগ করেন, "নজরুলের 'বাঁধন হারা' উপন্যাসের চরিত্রগুলো একটাও মুসলমান সমাজের নয়– তারা সব ছদ্মনামে উচ্চ-শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে, তাদের হাবভাব, কথা-বার্তা, শিক্ষা-দীক্ষা, আমাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্ম-পরিবারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" (১৩৮২ : ৫৭১)। আবার নজিবর রহমানের (১৮৬০-১৯২৩) *আনোয়ারা* (১৯১৪) উপন্যাসের সমাজ মুসলমান সমাজের বাস্তব চিত্র নয়। আর আনোয়ারা চরিত্রের ভাবাদর্শ সীতা কিংবা সাবিত্রী থেকে নেয়া। (১৩৮২ : ৫৭০)। প্রাবন্ধিক বলেন, বাঙালি মুসলমান লেখক তাঁর নিজের সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞ– নিজের সমাজকে মুসলমান সমাজ এখনো ভালো করে জানে না।

রণেশ দাশগুপ্তের সমাজভাবনার মূলে আছে রাজনীতি। এ রাজনীতি চলমান সংগ্রাম ও বিজয়ের আশাবাদ এবং সেসঙ্গে সমাজেরও চালিকাশক্তি। তাঁর সমাজচেতনায় দেখা যায় ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি। তাঁর কাছে মার্কসবাদ কেবল রাজনীতির হাতিয়ার ছিল না, তা ছিল সার্বিক অর্থে জীবনদর্শন। (অজয় রায় ২০০২ : ২০৯)। একদিকে জাতির স্বাধীনতার অঙ্গীকার, অন্যদিকে সামন্ত-বিরোধিতা, শ্রেণি শোষণ থেকে মুক্তি তাঁর সমাজচেতনার মূলে সক্রিয় ছিল। রণেশ দাশগুপ্ত সমাজকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে দেখেন না– সমাজ ও রাজনীতি তাঁর চিন্তায় অবিমিশ্রভাবে থাকে। অর্থাৎ মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে রণেশ দাশগুপ্ত সমাজকে বিশ্লেষণ করেন। তাই তাঁর আলোচনার মূলে থাকে সমাজ আর রাজনীতির ক্রিয়াকারিত্ব।

ওণেশ দাশগুপ্তের *মুক্তিধারা* (১৯৮৯) গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের যে রাজনৈতিক বাস্তবতা, তার মূলে ছিল বাংলার সর্বস্তরের নিপীড়িত ও বঞ্চিত সমাজ। এ শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনা বাঙালি সমাজকে বহন করতে হয়েছে– এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই বাঙালি সমাজের হয়েছে। বাঙালি সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনা ও আশ্বাসে ই. পি. আর পুলিশ ও বেঙ্গল

রেজিমেন্ট গণবৈপ্লবিক ঝুঁকি নিয়েছিল। অন্যদিকে স্বৈরাচারী পাক-সামরিক শাসক বাংলার সমাজকে ভয় দেখাতে পারেনি। কিন্তু পাকিস্তানে বাঙালি সমাজের মনোবল অটুট ছিল। তাই বর্তমান মুক্তিসংগ্রামে বাংলার ঐতিহ্যিক জনসমাজ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে বাংলাদেশকে স্বৈরাচারের মোকাবেলা করতে হবে।

বাঙালি জাতির জীবনঘনিষ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ঋত্বিক আবদুল হক স্বাধীন বাংলাদেশের গাঢ়, গভীর মুক্তচিন্তার যুক্তিনিষ্ঠ, প্রগতিবাদী ও সত্যসন্ধ প্রাবন্ধিক। (নবারুণ বিশ্বাস ২০১২ : ফ্ল্যাপ)। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক ও প্রচারক। বাঙালি জাতির একাত্মতার আলোকে তিনি সমাজকে দেখেন। বাঙালি জাতির উন্নতি হওয়া মানে বাঙালি সমাজের উন্নতি। তাই বাঙালি জাতির উন্নতি তাঁর কাম্য। এজন্য তিনি জাতীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলোর সন্ধান করেন– যা বাঙালি সমাজকে বিকশিত করতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতিচর্চাকে আবশ্যক বলে মনে করেন। এছাড়া ইতিহাস, জাতীয় চরিত-কথার অনুসন্ধান আবশ্যক। এই অনুসন্ধান বাঙালি সমাজের অতীত ঐতিহ্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

আবদুল হক একজন উদার, মানবতাবাদী, প্রগতিশীল লেখক। "বাঙালি মুসলমান : ভূমিকা ও নিয়তি" প্রবন্ধে তিনি মুসলিম সমাজের আত্মবিচ্ছেদ ও তার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। লেখক বলেন : 'বাঙালী মুসলমান আত্মপ্রতিষ্ঠ ছিল না, তার বাঙালী-সত্তা লক্ষণীয় ছিল না। অতীতে ছিল না এবং এখনো খুব লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি।' (আবদুল হক ২০১৫ : ১১৬)। প্রাবন্ধিক বলেন, এর ফল বাঙালি মুসলমান সমাজের জন্য গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়েছে। 'এই সত্তাহীনতা বাঙালী মুসলমানের গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়েছে, শুধু অতীতে নয়, এখনো হচ্ছে এবং সাধারণভাবে স্বীকার না করা হলেও এর সঙ্গে তার অস্তিত্বের প্রশ্নও জড়িয়ে আছে।' (২০১৫ : ১১৬)। একথা সত্য, বাঙালি মুসলমান দীর্ঘদিনের ইতিহাসে অবিচ্ছিন্নভাবে, অকুণ্ঠিতভাবে 'সগৌরবে নিজেকে বাঙালী বলে ঘোষণা করেনি।' (২০১৫ : ১১৬)। লেখক বলেন, হিন্দুরা সেটা করতে পেরেছে। কিন্তু কেন? এর কারণ উদ্ধার করে "বাঙালী মুসলমান : ভূমিকা ও নিয়তি" প্রবন্ধে লেখক বলেন : 'এদের প্রধান ঐশ্বর্য যেটা ছিল সেটা হচ্ছে গোষ্ঠীচেতনা, গোষ্ঠীর প্রতি উৎসাহিত মনোভাব, যা থেকে রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য প্রেরণা সৃষ্টিশীল ধারায় উৎসারিত হয়েছে।' (২০১৫ : ১১৭)। কিন্তু বাংলার মুসলমানের সামাজিক চেতনা ভিন্ন। একদা ভারতবর্ষে বহিরাগত মুসলমান এসেছিল রাজ্যজয়ের কারণে এবং থেকে গিয়েছিল বিজয়ী হয়ে। বাঙালি দেশীয় মুসলমান তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিল। ফলে :

> বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস অনেকাংশে পশ্চিমাগত মুসলমানদের কাছে তার আত্মলোপ-প্ররোচনারই ইতিহাস। বাঙালী মুসলমান যে বাঙালী, পশ্চিমাগত নয়, এই চিন্তার দ্বারা কেন সে পীড়িত হয়েছে, বাঙালী হওয়াটাকে সে যেন একটা অপরাধ বলে গণ্য করেছে; আর

> তাই সকল ক্ষেত্রে পশ্চিমাগত মুসলমানদের নেতৃত্বকে– তা ভালো হোক মন্দই হোক– মেনে নেওয়াটাই তার মনে হয়েছে অবশ্যকরণীয়। (২০১৫ : ১১৮)

কী এর কারণ– সে বিষয়ে আবদুল হক বলেন যে, বাঙালি মুসলমান স্বদেশের ইতিহাস থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য মুসলিম দেশের ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চেয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, বাঙালি মুসলমান অন্যদেশের মুসলমানের ইতিহাসকে নিজের ইতিহাস মনে করেছে। নিজস্ব ইতিহাস সৃষ্টির চেষ্টা তারা করেনি। অন্য দেশের মুসলমানের জয়ে আনন্দ বোধ করেছে এবং পরাজয়ে বিমর্ষ হয়েছে। নিজে বিজয়ী হতে চায়নি। (২০১৫ : ১১৮)। আবদুল হক মনে করেন, মুসলমান একটা আত্মবিস্মৃত জাতি। নিজস্ব ঐতিহ্য নেই, চেতনা নেই– এটাই মুসলিম সমাজের সমস্যা। এখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এর পিছনেও অবশ্য কারণ ছিল। বাঙালি মুসলমান সর্বদাই অন্যের প্রতিক্রিয়ায় নিজের পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছে। হিন্দুর বিরুদ্ধে সে মুসলমান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সে বাঙালি। লেখক বলেন, বাঙালি মুসলমানকে স্বতন্ত্র্য ও স্বনির্ভর হতে হবে। এ বিষয়ে দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। এক. ভাষা; দুই. প্রাকৃতিক পরিবেশ বা ঐতিহ্য-চেতনা। এ দুটোকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজকে সামনে এগুতে হবে। আবদুল হক তাঁর "সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে" প্রবন্ধে বলেন যে, পাকিস্তান আমলে বাঙালি সমাজের সংস্কৃতি স্বাধীনতা ছিল না। আর আজ 'বাংলাদেশ থেকে প্রায় নিরুদ্দেশ নৈতিকতা।' (২০১৫ : ২২৬)। তবে প্রাবন্ধিক বলেন, পাকিস্তান আমলে বাঙালি সমাজের উল্লেখযোগ্য দিক হল ছাত্র-রাজনীতি। অন্যদিকে পাকিস্তান আমলে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা হিন্দুরা চলে যাওয়ায় 'বাঙালী মুসলিম সমাজে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের অনেক সম্প্রসারণ ঘটেছে।' (২০১৫ : ২২৭)। ১৯৭৩ সালে দেখা বাংলাদেশের সমাজে ব্যাংক ডাকাতি, তরুণী অপহরণ– এসব সামাজিক অধঃপতন, সাংস্কৃতিক অবনমন ও জাতীয়তাবাদের ভাঙন ঘটেছে। কারণ এসব পাকিস্তানিদের কালচার ছিল বলে আবদুল হক মনে করেন। "জাতীয় চরিত-কথা" প্রবন্ধে আবদুল হক বলেন, আমাদের সমাজেরও ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন না থেকে দায়িত্ব নিতে হবে সে ইতিহাসকে যথাযথ মূল্যায়ন করার। এক্ষেত্রে খালেদ, মুসা, ইকবালের চেয়ে বাঙালিদের প্রতি আমাদের চোখ ফেরাতে হবে বলে লেখক মনে করেন। "প্রত্যয়ের সাহিত্য" প্রবন্ধে আবদুল হক বলেন যে, ইউরোপ বা পশ্চিমবঙ্গের সমাজের মতো আমাদের সংস্কৃতি অতোটা ক্ষয়িষ্ণু নয়। আমাদের সমাজের সম্ভাবনা এখনো অনেক প্রবল। ষাটের দশকে লেখা এ প্রবন্ধে লেখক আরও বলেন, আমাদের যা অভাব তা হল–

জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীচেতনা। কারণ জাতীয়তাবোধ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংহতি ও সংগঠন– যা আমাদের ছিল ও আছে।

ভাষা-আন্দোলন পরবর্তী সময়ে যাঁরা সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আহমদ শরীফ অন্যতম। তবে ভাষা সম্পর্কে তাঁর রচনাও উল্লেখযোগ্য। আহমদ শরীফ বাংলাদেশের প্রথাবিরোধী লেখকদের পথিকৃৎ ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী এই লেখক সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে সাহসিকতাপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। তাঁর *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮), *স্বদেশ অন্বেষা* (১৯৭০), *বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৭৮), *যুগযন্ত্রণা* (১৯৭৪) প্রভৃতি গ্রন্থে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনন্য দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। আহমদ শরীফ দুর্নীতিপরায়ণ গণতন্ত্রের পরিবর্তে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র কামনা করেছেন। কারণ প্রকৃত 'মার্কসবাদীরাই জাতিকে, ব্যক্তি মানুষকে মুক্ত করতে পারে।' (আহমদ শরীফ ২০০০ : ৯৪)। অন্যদিকে তিনি বাঙালির সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। এ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে তিনি নীহাররঞ্জন রায় প্রদত্ত তুলনাটি গ্রহণ করেন। নীহাররঞ্জন রায় বলেন : 'বাঙালীর বৃত্তি যথার্থ বৈতসী।' (নীহাররঞ্জন রায় ১৪০০ : ২০৩)। এটি বাঙালি জাতি তথা বাঙালির সামাজিক চরিত্র। আহমদ শরীফ উপর্যুক্ত তুলনার সঙ্গে আরও একটু যোগ দিয়ে বলেন : 'আবার এও সত্য যে, বাঙালীরা মুখে আদর্শবাদী ও বৈরাগ্যধর্মী। কিন্তু প্রবৃত্তিতে তারা একান্তভাবে অধ্যাত্মবাদীর ভাষায় বস্তুবাদী, গণভাষায় জীবনবাদী, নীতিবিদের ভাষায় ভোগবাদী।' (আহমদ শরীফ ১৯৯৫ : ১৪)। আহমদ শরীফ বাঙালির জীবনাচরণ থেকে বাঙালি জাতি তথা সমাজের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। এ সাধারণ বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় বাঙালি সমাজ নানা বাধা বিপত্তিতে হেলে পড়ে কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে যায়। এ সমাজের আদর্শ ও ত্যাগ বিষয়টি কেবল মুখে চর্চিত হয়, কিন্তু জীবনাচরণে কিংবা সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয় না। বাস্তবে বাঙালি সমাজ নিজস্ব ভোগ এবং কেবল নিজের জীবন পরিচালনাতেই ব্যস্ত থাকে। আহমদ শরীফ বাঙালি সমাজের কেবল জীবনধারণের বিশিষ্টতাকে অনুসন্ধান করেননি, সমাজের অন্তর্নিহিত বিশিষ্টতাকেও খুঁজে দেখেছেন। ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে তিনি বাঙালি সমাজের বিদ্রোহীচেতনার অনুসন্ধান করেন। তিনি বলেন : 'বাঙালী অঙ্গে অনুগত, কিন্তু অন্তরে দ্রোহী চিরকালই। তাই সাত শতকেই সম্ভব হয়েছিল শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের পক্ষে বাঙালীর সমর্থনে-সহায়তায় ও সহযোগিতায় বলবীর্য প্রদর্শন। তারও আগে সগৌরবে স্মরেণ্য হচ্ছে আলেক্সাণ্ডারের সময় ময়ূর টোটেম-এর অনুগত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কালে 'গঙ্গা হৃদি' বা গঙ্গা হৃদয় রাজ্যের শক্তি সম্পদের কাহিনী।' (১৯৯৫ : ১৪)।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় দ্বন্দ্ব ছিল। এ দ্বন্দ্ব আর্য-অনার্যের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব ছিল সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আর্য-অনার্যের লড়াই একসময় বৌদ্ধ

বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়। আহমদ শরীফ বলেন : 'জৈব নিয়মেই সেকালের প্রথাগত ধর্মবিপ্লবের আবরণে সমাজ বিপ্লব দেখা দিল। এ বিপ্লবের সার্থক নেতা বর্ধমান মহাবীর গৌতমবুদ্ধ।' (১৯৭০ : ৯৪)। আহমদ শরীফ বুদ্ধ বিপ্লবকে প্রথাগত বিপ্লব বলেছেন, যা জৈব নিয়মে আবির্ভূত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

আহমদ শরীফ তাঁর *জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে* (১৯৭৪) গ্রন্থের "পূর্ব পুরুষ : উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য" প্রবন্ধে আমাদের সমাজের বড় বাধা কী– তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে জিজ্ঞাসাহীন নির্বোধ মানুষই বড় বাধা। এরা নিজে জিজ্ঞাসাহীন, পরের জ্ঞানে জ্ঞানী, পরের মুখে শেখা যুক্তি প্রয়োগে তারা তার্কিক হয়। দ্বিতীয়ত, তাদের যুক্তি একটাই– তাদের পূর্ব পুরুষরা সব ভাবনা দিয়ে গেছে। আর নতুন করে ভাবনার কিছু নেই। এখানেই আমাদের সমাজ আবদ্ধ হয়ে আছে আর এখানেই সমাজের যুক্তি, নীতি আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু পূর্ব পুরুষের দানে নয় বরং মানুষকে, সমাজকে বাঁচতে হয় নিজের সৃষ্ট চিন্তায়। তাই সমাজকে বাঁচাতে হলে 'অন্যের কৃতির ফল ভোগ করার পাগলামির মধ্যে নয়, নিজের কৃতি ও কীর্তির উল্লাসের মধ্যে বাঁচাই যথার্থ বাঁচা।' (১৯৭৪ : ৬৪)। সমাজ ও মানুষ এটাই কামনা করে। *মানবতা ও গণমুক্তি* (১৯৯০) গ্রন্থের "আবর্তিত সমাজের আজকের সংকট" প্রবন্ধে আহমদ শরীফ বলেন, সৎ ও মানবপ্রেমিক মানুষ আজ ক্ষমতায় যেতে পারে না। বাংলাদেশেও তাই। লেখক এ সম্পর্কে বলেন :

> রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বর্বর স্বেচ্ছাচার, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও আর্থিক সংকট, দুঃশাসনিক নৈরাজ্য ও নীতি-নিয়ম-রীতির বিকৃতি, জনজীবন ও জীবিকায় আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক এমনকি সম্পদের ও শরীরের নিরাপত্তার একটা ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক নৈরাজ্য ও অবসাদ; অন্যদিকে দৈহিক শক্তিতে ঋদ্ধ, মানসিক শক্তিতে নিঃস্ব, বয়সে তরুণ মৃত্যুচিন্তাশূণ্য তরুণ প্রৌঢ়দের করেছে বেপরওয়া ও লুটেরা। (১৯৯০ : ৩১)

"জনসমাজের প্রতি নিয়মরিক্ততার কারণ" প্রবন্ধে আহমদ শরীফ বলেন, হাজার বছরের বর্ণাশ্রম প্রথা চালু বলেই সবল ও দুর্বলের মধ্যেকার সম্পর্কের কারণে এখনো আমাদের সমাজে 'প্রবলমাত্রই প্রভুত্বকামী, দুর্বলের অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য প্রত্যাশী।' (২০০১ : ৩৭৯)। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আহমদ শরীফ সম্পর্কে বলেন : 'তিনি হিতবাদী, তাঁর লক্ষ্য নিজের সমাজ ও জাতির সদস্যদের উন্নতি। এই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি স্থাপন করেন ব্যক্তিকে। কিন্তু ব্যক্তির সুখ কিছুতেই আসবে না, সমষ্টিকে বাদ দিয়ে। কেবল তাই নয়, সামষ্টিক শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে ব্যক্তির মুক্তির লক্ষ্যে।' (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২০০১ : ১৫৮)।

বদরুদ্দীন উমরের প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা অনেক। তিনি বাংলাদেশের মার্কসীয় ধারার অন্যতম লেখক। মননশীল ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। দেশের রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা-আন্দোলন ছিল তাঁর প্রবন্ধের মূল বিষয়। ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের বা আরও নির্দিষ্ট অর্থে মধ্যবিত্তশ্রেণির স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর। *সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৬), *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১৯৭০) তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ।

বদরুদ্দীন উমর বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক, বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের মূল সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন। 'বাংলাদেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বাস্তবায়ন এবং আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার আমূল পুনর্গঠন তাঁর লক্ষ্য।' (আবুল কাসেম ফজলুল হক ২০১৫ : ৯১)। কিন্তু প্রাচীন বাংলা বা মধ্যযুগের বাংলার সমাজব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের কোনো চেতনা বিরাজমান ছিল কি না– এ সম্পর্কে তাঁর কোনো বক্তব্য দেখা যায় না। তবে তিনি বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য দেশের শোষক শ্রেণিকে উৎখাত করা চাই। সমাজের নেতিবাচক দিক– চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, জখম সমাজের দোষ নয়, এসব রাজনীতির ত্রুটির ফল। যেহেতু বদরুদ্দীন উমরের মতে সমাজ ও রাজনীতি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য, তাই রাজনীতি বিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে সমাজের বিষময় ফলগুলো দূর করতে হবে। সমাজে সাম্রাজ্যবাদী এন.জি.ও.-গুলো সাময়িকভাবে নিঃস্ব কৃষক ও সমাজের উন্নয়ন আনছে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কোনো উন্নতি এতে দেখা যায় না। কারণ কৃষক সমাজের কোনো পরিবর্তন এ পর্যন্ত দেখা যায়নি। বর্তমান সমাজের কৃষকের উন্নতি মানে কৃষির ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার উন্নতি। কিন্তু শ্রমিক ও কৃষক পূর্বাবস্থায়ই আছে।

বাংলাদেশের সমাজে সন্ত্রাস বৃদ্ধির কারণ রাজনীতি। বর্তমানে সন্ত্রাসীদের ফলাও করে তাদের জীবনকাহিনি পত্রিকাগুলো প্রচার করে। এতে করে তারা নায়ক হয়ে ওঠে। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা তাতে প্রভাবিত হয় বলে বদরুদ্দীন উমর মনে করেন।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রবন্ধের উৎস সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও তার সংকট ও সমাধান এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিসংগ্রাম। (আজহার ইসলাম ১৯৯৯ : ১০১)। *বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক* (১৯৭৬), *শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ* (১৯৭৫), *বৃত্তের ভাঙাগড়া* (১৯৮৪) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজব্যবস্থায় মানবমুক্তির অনুসন্ধান করেছেন। তিনি দেখান যে, যাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং বাংলায় মানবমুক্তির জন্যে কাজ করেছেন, তাঁরাও শ্রেণিসচেতন ছিলেন না। তাঁর আলোচনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনীতি সম্পৃক্ত– সেটা

উনিশ শতকে ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি। এ রাজনীতির আলোচনা করতে গিয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বাংলার রেনেসাঁর রাজনৈতিক পরিচয় তুলে ধরেন। তাঁর মতে, উনিশ শতকের রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) চিন্তা ধর্মবাদী, ইহজাগতিক নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও (১৮২০-১৮৯১) ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁরা সকলে শ্রেণিসচেতন ছিলেন না। তাঁর মতে, শ্রেণিসচেতন না হলে অসচেতনভাবে শ্রেণির পক্ষে কাজ করা সহজ, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ভাবা কঠিন। ফলে শ্রেণির লড়াই থেকেই গেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান ঔপনিবেশিক কালে বাংলাদেশে ভাষাভিত্তিক ও আত্মরক্ষামূলক বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর্থসামাজিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণি-বিভাজন বাঙালির মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে– একত্ব সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেম না হয়ে কেবল রাজনৈতিক হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব, কারণ ‘তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ ও রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করে থাকেন। সামাজিক মানুষের শ্রেণিগত অবস্থানকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন ঘটিয়ে থাকেন।’ (রহমান হাবিব ২০০৭ : ১৪০)। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সমাজভাবনা আলাদা করে নয়– অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কারণ রাজনীতি ছাড়া সমাজ নেই। অথনীতির উপর সকল সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সমাজ তথা বাংলাদেশ প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর *ভয় পেয়ো না, বেঁচে আছি* (১৯৭৫) গ্রন্থের “আত্মপ্রেমিক ও মৈত্রীপ্রবণ” প্রবন্ধে বলেন, আমরা যে সমাজে বাস করছি তা পুঁজিবাদী সমাজ। পুঁজিবাদ সর্বদা আত্মপ্রেমিক। আত্মপ্রেমিক সর্বদা আত্মস্বার্থকে দেখে। লেখক বলেন : ‘এই যে আত্মস্বার্থসর্বস্বতা– বাংলাদেশে আজ এটাই প্রথম ও প্রধান সত্য।’ (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৭৫ : ১৫)। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সেই সমাজ চান– যে সমাজে মানুষের মুক্তি থাকবে। অর্থাৎ তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কামনা করেন। এখন তার জন্যে দরকার একটি দর্শন। তাঁর ভাষায় : ‘প্রয়োজন তাই সামাজিক মানুষের মুক্তির দর্শন।’ (১৯৮৮ : ১৫)। কিন্তু এ দর্শনের চর্চা আমাদের সমাজ করেনি। ফলে সকল প্রকার কায়েমি স্বার্থ থেকে মুক্ত হবার ও ভয় না পাবার মানসিকতা তার জন্মেনি। লেখক বলেন, কেবল সমাজে নয়, চিন্তাতেও আছে– যান্ত্রিকতা ও শ্রমবিমুখতা এবং সামন্তবাদী চিন্তা ও পুঁজিবাদী মানসিকতা। ফলে আমাদের সমাজে জন্ম নিয়েছে মার্কসবাদী মোল্লা-তান্ত্রিকতা। তারা কেবল তত্ত্বের মধ্যে জীবন ও সমাজকে দেখে, তাদের মার্কসীয় ভাবনা তথা দর্শনও ‘ভয় করে বাস্তবতাকে।’ (১৯৮৮ : ১৬)। *স্বপ্নের আলো ছায়া* (১৯৯১) গ্রন্থের “রাজত্ব কার” প্রবন্ধে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতায় কার প্রাধান্য চলছে– তা বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক বলেন, অরাজকতা, দরিদ্রতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের সমাজকে আক্রান্ত করে

চলছে। তিনি এসব প্রভাবককে সমাজ ও দেশের শত্রু বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায় : 'বাংলাদেশে এখন রাজত্ব চলছে তিন শত্রুর : অরাজকতার, দরিদ্রের এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের।' (১৯৯২ : ৫)। এখন এর থেকে পরিত্রাণের পথ কী– এ বিষয়ে লেখক বলেন, 'বাঙালী সংস্কৃতির মুক্তি চাই।' (১৯৯২ : ১৪)। এর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হবে, দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, বাঙালির সমাজকে বাঁচাতে হলে সমাজতন্ত্র ছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় পথ নেই। পুঁজিবাদ কিছুই ভালো করতে পারবে না, কেবল সর্বনাশ ছাড়া। *এর পথ ওর প্রাচীর* (১৯৯৫) গ্রন্থের "দ্বিতীয় বাস্তবতা" প্রবন্ধে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বাঙালির সমাজব্যবস্থার মধ্যে একটা বিভাজনের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু বাংলাদেশেরও সমাজ ভাগ হয়ে যাচ্ছে– ইংরেজি জানা ও না জানাদের মধ্যে। এ বিভাজনের মূলে আছে আর্থিক বৈষম্য। রাষ্ট্রে আমরা জাতীয়তাবাদী কিন্তু সমাজে থাকে দুই জাতি– উঁচু ও নিচু। এ বিভাজন আমাদের সমাজে বেড়েই চলছে বলে লেখক মনে করেন। গ্রন্থকার মনে করেন, বিভাজন যদি এভাবে বাড়তে থাকে, তাহলে একদিন আমাদের সমাজের ভাষা বাংলাকে আমাদের রাষ্ট্রের ভাষা করে রাখতে পারবো না। ধীরে ধীরে বাংলার সঙ্গে ইংরেজির দাপট দেখা দেবে। তখন আর সকলের কাছে বাংলা ভাষার কদর থাকবে না। এখন তাই ভাষার পক্ষে দাঁড়ানো দরকার। লেখক বলেন : 'বাংলা ভাষার পক্ষে দাঁড়ানো অর্থ এখন একটি বৈষম্যহীন সমাজের পক্ষেই দাঁড়ানো আসলে। বৈষম্য বৃদ্ধি করে আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রাখতে পারব না।' (১৯৯৫ : ৭৭)।

মননশীল নির্ভীক লেখক হিসাবে আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বামপন্থি চিন্তাধারার লেখক হিসাবে নতুন আঙ্গিকের অনন্য উপস্থাপনায় তিনি পাঠককে আকৃষ্ট করেছেন। *জাগ্রত বাংলাদেশ* (১৯৭১), *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* (১৯৭৩), *বাঙালি মুসলমানের মন* (১৯৭৯) প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগ্রন্থ। আহমদ ছফা বাংলাদেশের প্রথম লেখক যিনি বাংলাদেশে জাতিসত্তার উন্মেষ ও জাতীয় রাষ্ট্রের সঙ্কটকে বাঙালি মুসলমানের ঐতিহাসিক উপলব্ধি হিসেবে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। (সলিমুল্লাহ খান ২০১০ : ২৭১)। তাঁর লক্ষ্য প্রধানত মুসলিম সমাজ। তিনি মনে করেন, মুসলিম রাজশক্তি বাংলার সমাজকাঠামোয় কোনো পরিবর্তন আনেনি, কেবল শাসনের প্রয়োজনে কিছুটা পরিবর্তন করেছিলেন। আহমদ ছফার ভাষায় : 'বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই বাংলার আদিম কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের লোক। তাদের মানসিকতার মধ্যেও আদিম-সমাজের চিন্তনপদ্ধতির লক্ষণসমূহ সুপ্রকট।' (আহমদ ছফা ২০০৬ : ৩১)। তাই মুসলিম সমাজের দীনতা স্পষ্ট, কিন্তু আজ জাতীয় ঐক্যে তার নিজস্ব পরিচয় ফুটিয়ে তোলার সময় এসেছে। আহমদ ছফা বাঙালি সমাজের মধ্যে হিন্দুসমাজ নিয়ে তেমন আলোচনা করেননি। তবে

মুসলিম সমাজের কথা প্রসঙ্গে হিন্দুসমাজ নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন যে, মুসলিম শাসন আমলে হিন্দুসমাজে আত্মরক্ষাটাই ছিল বড়। ‘আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যখনই কোনো নতুন সামাজিক পরিণাম এবং নবতরো মূল্যচেতনা সমাজের অভ্যন্তর থেকে সূচিত হয়েছে, তার প্রাণবস্তুটি সাহিত্যস্রষ্টাদের কণ্ঠে আপনা থেকেই কথা কয়ে উঠেছে।’ (আহমদ ছফা ১৩৯৯ : ১৪)। অর্থাৎ মুসলমান শাসন আমলে হিন্দুসমাজে যে রূপান্তর ঘটেছিল, সেখানে সমাজবাস্তবতার সঙ্গে সংস্কারকদের চিন্তায় তার মিল ছিল। এই সামাজিক পরিবর্তনে হিন্দুরা নিজেদের সংস্কৃতিকে নিজেদের প্রয়োজনে নতুনভাবে রূপদান করেছিলেন। সেখানে বিষয়ে ও বিষয়ীর সঙ্গে কোনো দূরত্ব নেই। (১৩৯৯ : ১৪)। আহমদ ছফা বলেন, মুসলমান সমাজে অন্যরকম ঘটনা ঘটেছে। মধ্যযুগে মুসলমান পুঁথি লেখকরা সচেতনভাবে এক সামাজিক আদর্শ থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটি সামাজিক আদর্শ, একটি শিল্পাদর্শের বদলে আরেকটি শিল্পাদর্শ নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কিন্তু নতুন শিল্পাদর্শটির চেহারা কীরকম হবে, অতীতের কতোদূর বহন করবে, কতোদূর বর্জন করবে, তাদের মনে কোনো পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল না। দেখা যায় যে, মধ্যযুগের মুসলমান সমাজের পুঁথি লেখকরা হিন্দুসমাজের দেব-দেবী, নায়ক-নায়িকার প্রভাব থেকে তাদের মনকে মুক্ত করতে পারেনি। (১৩৯৯ : ১৭, ১৪)। তাই তারা যখন সচেতনভাবে কোনো চরিত্র নির্মাণ করেছেন, তখন দেব-দেবীর মতোই চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাদের চরিত্রগুলো নামে আরবীয় কিন্তু চেতনা, বিশ্বাস ও কর্মে এদেশীয়। কারণ ‘বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা সাহিত্যের দুই মূখ্য উপাদান।’ (১৩৯৯ : ১৫)। এর থেকে বোঝা সহজ যে, বাঙালি মুসলমানের চিন্তা বাংলাদেশের সাহিত্য থেকেই উত্থিত। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমান এদেশের কৃষিভিত্তিক কৌম-সমাজের লোক। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের মন এখনো আদিম অবস্থায় রয়ে গেছে। এর কারণ বাঙালি হওয়ার জন্যে নয়, মুসলমান হওয়ার জন্যেও নয়। কারণ– বহুকালব্যাপী তারা একটি পদ্ধতির মধ্যে, ভীতির মধ্যে জীবন যাপন করেছে। সেই মানসিক ভীতিই বাঙালি মুসলমান সমাজকে চালিত করেছে। আজ বাঙালি মুসলমানের মনের প্রবণতাগুলো বিশ্লেষণ করলে তার আদিম অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন।

আবুল কাসেম ফজলুল হকের (জ. ১৯৪৪) সাহিত্য প্রতিভা প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। তিনি সাহিত্যচর্চার চেয়ে রাজনীতি ও সমাজনীতিচর্চায় বেশি আগ্রহী। *কালের যাত্রার ধ্বনি* (১৯৭৩), *রাজনীতি ও দর্শন* (১৯৮৮), *একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন* (১৯৭৬) প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ।

আবুল কাসেম ফজলুল হক দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের বৈষম্যের পার্থক্য কমিয়ে শ্রেণি-বিভাজন রোধ করার দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন। অন্যদিকে, ‘বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে তিনি রাজনীতি ও মার্কসবাদের সম্পর্কসূত্রে

বিশ্লেষণ করেছেন।' (মোঃ হাবিবুর রহমান ২০০৩ : ১৬৬)। তাঁর মতে, প্রাক্-ব্রিটিশ বাংলার সমাজব্যবস্থা ছিল আত্মরক্ষায় অসমর্থ। ব্রিটিশ শাসনামলে আঠার শতক পর্যন্ত বাংলায় বণিক-শ্রেণির আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটে; আর মধ্যবিত্ত-শ্রেণির মাধ্যমে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয়। আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর "মানুষের স্বরূপ" প্রবন্ধে বলেন যে, একুশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশের সমাজে যারা ধনী ও ক্ষমতাবান, তাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তিতান্ত্রিক ভোগবিলাসিতা প্রবল। অন্যদিকে শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবোধও প্রবল। আর সমাজে 'সকলের মধ্যেই সামাজিক চেতনা ও সংহতি নিতান্ত দুর্বল।' (আবুল কাসেম ফজলুল হক ২০১১ : ২১৩)। লেখক বলেন, বর্তমানে সমাজে মানুষের মধ্যে মানুষের ক্ষতি করার যে শক্তি, তাকেই শক্তি বলে স্বীকার করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে আর কল্যাণ করার শক্তিকে অস্বীকার করা হচ্ছে। সমাজে ক্ষমতাবান ও ধনী লোকদেরকে সাধারণ লোকেরা ভয় পায় এবং ঘৃণার চোখে দেখে। বর্তমান সমাজে মানুষের বসবাসের ঘনত্ব খুব বেশি– পরস্পর মিলেমিশে একাকার কিন্তু একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন। সামাজিক চেতনায় মানুষের প্রতি মানুষের মানবিক আকর্ষণ, সহানুভূতি বা কৌতূহল এসব নেই বললেই চলে। এখানে সকলে একে অন্যের ত্রুটি ধরতেই ব্যস্ত কিন্তু নিজের ত্রুটির দিকে খেয়াল নেই। এখানে প্রতিপক্ষ বড় হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু জাতীয় সমস্যা, সমাজের সমস্যা নিয়ে কেউ ভাবে না। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত– সামাজিক দায়িত্ব কেউ অনুভব করে না। "মানুষের স্বরূপ" প্রবন্ধে লেখক আরও বলেন, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর সম্পূরক। 'মানুষের সামাজিক পরিচয় আছে, সেই সঙ্গে আছে ব্যক্তিগত পরিচয়ও। কোনোটাই কোনোটার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।' (২০১১ : ২১৪)। উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সৃষ্টির প্রয়োজনে কখনো মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তাকে প্রাধ্যান্য দিতে হয়। লেখকের চিন্তায়, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যেমন বিরোধ আছে, তেমনি ঐক্যও আছে। লেখক এ সম্পর্কে বলেন : 'সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে সমাজের প্রায় সকল স্তরেই যৌথ কর্মকাণ্ডে ভাবালুতা, আবেগসর্বস্বতা, ধূর্ততা, চতুরতা, ভাঁওতা, প্রতারণা, অন্ধবিশ্বাস, গতানুগতিক দাসত্ব ইত্যাদিকেই প্রবল দেখা যাচ্ছে। বিবেক ও বুদ্ধির অনুশীলন অল্পই দেখা যাচ্ছে।' (২০১১ : ২২৩)। সমাজে সৃষ্টিশীল ও প্রগতিশীলদের মধ্যেও বিবেক-বুদ্ধির ভূমিকা নগন্য দেখা যায়। আজকের সমাজের এই মানুষগুলোও নিজের বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগান না। ফলে চতুর, ধূর্ত ও ভাঁওতা-র মোকাবেলা করতে গিয়ে পরাজিত হন। অবশেষে তারাও ধূর্ততার পথ গ্রহণ করেন। এখন এ অবস্থায় সমাজের মঙ্গলের জন্য করণীয় বিষয়ে আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, এ অবস্থায় এ দেশে নতুন সৃষ্টি ও প্রগতির উদ্যোগ চাই। বিবেক-বুদ্ধির স্বরূপ ও ভূমিকা সম্পর্কে, সেই সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধির বিকার সম্পর্কেও চাই সর্বাধিক সচেতনতা। আর চাই সকল সময়ে সৃজনপ্রয়াসী, প্রগতি

অভিলাষী সকলের চেষ্টায় ও কর্মে; বিশেষ করে সম্মিলিত চিন্তায়-কর্মে বুদ্ধির প্রকৃষ্টতম প্রয়োগ। (২০১১ : ২২৪)। নিজের যুক্তিকে অন্ধবিশ্বাস বা কেবল অন্যকে পরাজিত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। বরং যা ন্যায়, সুন্দর, শুভ ও কর্তব্য বলে বিবেচিত, তাকেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তির প্রয়োগ করা দরকার বলে লেখক মনে করেন। তিনি বলেন, সমাজে মানুষের বস্তুবাদী চেতনা যেমন দরকার, তেমনি সৃজনশীল কল্পনাও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের কল্যাণ করার শক্তিকে অধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। সমাজের ও মানুষের ক্ষতি হয়– এমন শক্তি ও ভাবনা প্রতিহত করার চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে সকলের সজাগ দৃষ্টি ও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সেসঙ্গে সমাজে নৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। এজন্য দরকার উন্নততর কর্মপদ্ধতি, কর্মনীতি ও সচেতন মানুষের ঐক্যবদ্ধতা। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোকে মানবিক, ত্যাগী ও সমাজতান্ত্রিক চেতনায় গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। আর এর মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রগতিশীল ও উন্নতির পথে চালিত হতে পারবে। এর জন্যে দরকার ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কেননা 'ইতিহাসে দেখা যায়, যুগে যুগে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মোকাবেলায় অপশক্তির পরাজয় ঘটে।' (২০১১ : ২২৪)।

সামগ্রিক আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায় যে, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কার করা এবং বুদ্ধির মুক্তি ঘটানো সেসঙ্গে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা। সমাজচিন্তায় আবুল ফজল মুসলিম সমাজের সংস্কার চান। তিনি নারী শিক্ষা ও নারীর অবরোধ থেকে মুক্তি কামনা করেন। আবুল ফজল জানান, এখনো কোনো লেখক মুসলিম সমাজকে ভালো করে জানেন না। যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা মুসলিম সমাজের সঠিক চিত্র আঁকেননি। রণেশ দাশগুপ্ত সমাজ ও রাজনীতিকে অভিন্নভাবে দেখেন। তাঁর মতে, রাজনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রকে পরিবর্তন করতে হবে আর সে রাষ্ট্র সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে। আবদুল হক মনে করেন, বাঙালি মুসলমান সমাজের উন্নতি বাঙালি জাতির উন্নতির উপর নির্ভর করছে। বাংলার বাইরের মুসলমান আর বাঙালি মুসলমান ভিন্ন। দীর্ঘদিন বাঙালি মুসলমান শাসন-শোষণে থাকায় স্বাধীন বাংলাদেশে আজ তাদের বিকাশের সুযোগ দেখা দিয়েছে। আহমদ শরীফ বাঙালি সমাজের সংগ্রামে বিশ্বাস করেন। বাঙালি নিজের ভোগ ও নিজেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে বলে মনে করেন তিনি। তবে বাংলাদেশের সমাজে এখন নৈরাজ্য ও হতাশা বিরাজমান। কিন্তু তিনি বলেন, সমষ্টিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির মুক্তি ঘটতে পারে না। বদরুদ্দীন উমর রাষ্ট্র ও সমাজকে আলাদা করে দেখেন না। তবে তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন কামনা করেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সমাজভাবনা রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রে দারিদ্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈষম্য ব্যাপক । এ বৈষম্য ও অরাজকতা ঠেকাতে হবে।

তবেই বাংলাদেশ সমাজ ও রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়াতে পারবে। আহমদ ছফা বলেন, বাংলার মুসলিম সমাজ আদিম কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজ। বাঙালি মুসলিম সমাজ নিজের আদর্শ গড়ে তুলতে পারেনি। কেন পারেনি, তার কারণ বিশ্লেষণ করলে সেখান থেকে তার বেরিয়ে আসার পথ পাওয়া যাবে। আবুল কাশেম ফজলুল হকের মতে, ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজের উন্নতি করা দরকার। ন্যায়, সত্য ও শুভ শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে আর অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

মূলত, মুসলিম সমাজের সকল প্রকার রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সংস্কারমুক্ত, যুক্তিশীল, মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠাই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র উদ্দেশ্য ছিল। আবুল ফজলের সমাজচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রাধান্য পেয়েছে– স্বদেশ ও সমাজের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। সারাজীবন তিনি শুভবোধ ও কল্যাণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। রণেশ দাশগুপ্ত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে জোর দিয়েছেন। আবদুল হক বাঙালি সমাজকে যৌক্তিক, মননশীল ও মানবিক দৃষ্টিতে পুনর্নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন। আহমদ শরীফ দুর্নীতিমুক্ত ও প্রগতিচেতনাসম্পন্ন বাঙালি সমাজ কামনা করেছেন। বদরুদ্দীরন উমর সমাজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রবণতাগুলো অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে একটি শ্রেণিশোষণহীন সমাজের প্রত্যাশা করেছেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। আহমদ ছফা মনে করেন, বাঙালি মুসলমান সমাজে যে প্রচ্ছন্ন পরাধীন হীনমন্যতা জন্ম নিয়েছে– প্রজ্ঞাচর্চার প্রসারণের মাধ্যমেই বাঙালি সমাজ তা থেকে মুক্ত হতে পারে। আবুল কাসেম ফজলুল হকের বিবেচনায়, বর্তমান সমাজ নানা ধরনের অনিয়মে জর্জরিত– এখান থেকে সমাজকে মুক্ত করতেই হবে। উপর্যুক্ত প্রাবন্ধিকগণ প্রকৃতপক্ষে একটি মানবিকতাবাদী সমাজকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিতি করার জন্য মসীযুদ্ধ চালিয়েছেন।

## রচনাপঞ্জি

অজয় রায় (২০০২), 'রণেশদা, রণেশ দাশগুপ্ত ও রাজনীতি', *রণেশ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ*, (সম্পাদক : সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

অধীর দে (১৯৯৬), *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা* (প্রথম খণ্ড), উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

(২০০৭), *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা* (দ্বিতীয় খণ্ড), উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৩), *বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা*, উচ্চারণ, কলকাতা।

(২০১৬), *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

আজহার ইসলাম (১৯৯৯), *চিরায়ত সাহিত্য ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবুল আহসান চৌধুরী (১৯৯৩), *মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০১৫), *মুসলিম সাহিত্য সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণী*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৯৬), "বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের প্রবন্ধ সাহিত্য", *একুশের প্রবন্ধ* ৯৬, (প্রকাশক : শামসুজ্জামান খান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০৮), *বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকাল*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০১৫), 'বদরুদ্দিন উমর (জ.১৯৩১)', *বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্য*, কথা প্রকাশ, ঢাকা।

(২০১১), 'রেনেসাঁসের পথ আমাদের পথ', 'বাংলাদেশে ভালো নেতৃত্বের অভাব কেন', 'উন্নত মানের জন্য রাষ্ট্র', 'মানুষের স্বরূপ', 'সাহিত্যের সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও সাহিত্য স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, (প্রকাশক : মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন), কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৮৮), "স্বাধীনতাউত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ, প্রসঙ্গ– প্রবন্ধ ও গবেষণা", *একুশের প্রবন্ধ ১৯৮৮*, (প্রকাশক : শামসুজ্জামান খান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুল হক (১৯৭৮), 'ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজ', *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও সৈয়দ আকরম হোসেন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(২০১৫), 'বাঙালি মুসলমান : ভূমিকা ও নিয়তি, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, (সম্পাদক : মাহবুব বোরহান), কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

আবুল ফজল (১৩৮২),'নারী জাগরণ', 'প্রথা', 'মুসলমান কথা-সাহিত্যের গতি ও পরিণতি', *আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের ধারা, আবুল ফজল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বইঘর, চট্টগ্রাম।

আহমদ ছফা (১৩৯৯), 'বাঙালি মানুষের মন', *বাঙালি মুসলমানের মন*, (প্রকাশক : মোহাম্মদ নিয়ামত উল্লাহ), স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

(২০০৬), *বাঙালি মুসলমানের মন*, খান ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোম্পানী, ঢাকা।

আহমদ শরীফ (২০০০), 'মার্কসবাদীদের এই মুহূর্তের দায়িত্ব ও কর্তব্য', *বিশ্বায়নবাদ-বিজ্ঞানবাদ-যুক্তিবাদ-মৌলবাদ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

(১৯৯৫), *সময় সমাজ মানুষ*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

(১৯৭০), *জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে*, আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা।

(১৯৭৪), 'পূর্ব পুরুষ : উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য', *জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে*, আদিল পাবলিশার্স এ্যাণ্ড কোং, ঢাকা।

(১৯৯০), 'আবর্তিত সমাজের আজকের সংকট', *মানবতা ও গণমুক্তি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০০১), 'জনসমাজের প্রতি নিয়মরিক্ততার কারণ', *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলী*, (সম্পাদক : আফজালুল বাসার), অনন্যা, ঢাকা।

খোন্দকার সিরাজুল হক (১৯৮৪), *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

গোপাল হালদার (২০১৫), *বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা* (দ্বিতীয় খণ্ড), মুক্তধারা, ঢাকা।

নবারুণ বিশ্বাস (২০১২), *আবদুল হকের প্রবন্ধ: সমাজ ও রাজনীতি*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

নীহাররঞ্জন রায় (১৪০০), *বাঙালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

প্রমথ চৌধুরী (১৯৯৩), "ভূমিকা", *প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৯), *বাংলাদেশের সাহিত্য*, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০০০), "বিশ শতকের বাংলাদেশ : সাহিত্যচিন্তার ক্রমবিকাশ", *একুশের প্রবন্ধ ২০০০*, (প্রকাশক : সেলিনা হোসেন), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু (১৯৮৪), "সাহিত্যপত্র", *দেশ*, (সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ), সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন (১৯৩৩-১৯৮৩), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ভূদেব চৌধুরী (২০১৫), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- দ্বিতীয় পর্যায়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মাহবুবুল হক (২০০৯), 'আবুল ফজল : দায়বদ্ধ লেখক ও সজাগ বুদ্ধিজীবী', *মানবতন্ত্রী আবুল ফজল : শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ*, (সম্পাদক : আনিসুজ্জামান, মাহবুবুল হক, শামসুল হোসাইন, ভূঁইয়া ইকবাল, আবুল মোমেন), সময় প্রকাশন, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান (২০১০), "বাংলা গদ্যের পরিণতি", *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক (২০০৯), 'আবুল ফজলের সংবর্ধণা', মানবতন্ত্রী আবুল ফজল : শতবার্ষিক স্মরকগ্রন্থ, (সম্পাদক : আনিসুজ্জামান, মাহবুবুল হক, শামসুল হোসাইন ও অন্যান্য), সময় প্রকাশন, ঢাকা।

মোঃ হাবিবুর রহমান (২০০৩), '*বাংলাদেশের প্রবন্ধ : সমাজ ও রাজনীতি' (১৯৫০-২০০০)*, পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ, তত্ত্বাবধায়ক : সৌদা আখতার, বাংলা বিভাগ, কলা ও মানবিকী অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০০), "বিশ শতকের বাংলাদেশ : প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ", *একুশের প্রবন্ধ ২০০০*, (প্রকাশক : সেলিনা হোসেন), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রহমান হাবিব (২০০৭), 'সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (জ. ১৯৩৬) : শ্রেণি-সচেতন মার্কসবাদী লেখক', *বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সলিমুল্লাহ খান (২০১০), 'বাঙালি মুসলমানের ফাঁড়া', *আহমদ ছফা সঞ্জীবনী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০১), 'আহমদ শরীফের স্বতঃস্ফূর্ত উপচিকীর্ষা', *আহমদ শরীফ স্মারকগ্রন্থ*, (সম্পাদক : মুস্তাফা মজিদ ও আফজালুল বাসার), ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(১৯৭৫), 'আত্মপ্রেমিক ও মৈত্রীপ্রবণ', *ভয় পেয়ো না, বেঁচে আছি*, অনন্যা, ঢাকা।

(১৯৮৮), 'সমাজ, দর্শন ও বাস্তবতা', *স্বাধীনতার স্পৃহা, সাম্যের ভয়*, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(১৯৯২), 'রাজত্ব কার', *স্বপ্নের আলো ছায়া*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

(১৯৯৫), 'দ্বিতীয় বাস্তবতা', *এর পথ ওর প্রাচীর*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা।

সুকুমার সেন (২০১৫), *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

[**Abstract :** 'Muslim Shahitya Samaj' practised free thinking and emancipation of thought in the Bangalee Muslim Society. Abul Fazal says that the Muslim writers donot know the nature of their own society. Ranesh Dashgupta thinks that Society is not separate from politics. Politics is the conductive force of lifes struggle and society. Abdul Haque says that the Muslims of Bengal, for a along time, had not declard themselves as Bangalee. Ahmed Sharif thinks that there was conflict in Indian Society– which was a protest against injustice. Professor Badruddin Ahmed wants the society changed from its root to social system. Abul Kashem Fazlul Haque desires the change of the present society. Sirajul Islam Chowdhuri thinks that Banglash is in attack with anarchy, poverty and natural disaster. Ahmed Chhafa says that most of the Muslims of Bangladesh belong to the people of primitive agriculture-based-class society. There is the impression of primitive thinking in the thought process of Bangalee Muslims. These types of thoughts about Society of the miscellanists are discussed in this article.]